Journal of ELT and Education
ISSN (Print): 2618-1290, ISSN (Online): 2663-1482
2025, Volume 8, Issue 2, Page: 57-61
Center for Academic Research and Development (CARD)

সেলিনা হোসেনের উৎস থেকে নিরন্তর : জীবন সঙ্কটের রূপায়ণ

মোঃ তুহিন হাসান*

সারসংক্ষেপ: ষাটের দশকে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের অঙ্গনে ছোটগল্পকার হিসেবে খ্যাতিমান কথাশিল্পী সেলিনা হোসেনের দীপ্র আবির্ভাব। মানব জীবনের নানা প্রান্তর গভীর মমতায় শিল্পরূপ পেয়েছে তাঁর ছোটগল্পগুলোতে; যার উৎকৃষ্ট উদাহরণ তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'উৎস থেকে নিরন্তর'। তাঁর এই গ্রন্থে গ্রামীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কর্মহীনতা ও জীবিকার সঙ্কট, আর্থিক সঙ্কটে জর্জরিত নিম্নবিত্তের প্রান্তিক পরিস্থিতি, বৈষম্য ও নিপীড়নমূলক সমাজে শ্রমজীবী মানুষের জীবনের সঙ্কট, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সরকারি চাকরিজীবীদের মনোজগতে পেশাদারিত্ব ও হৃদয় অনুভূতির মধ্যে দ্বন্দ্ব, পিতৃপরিচয়হীন নারীর জীবনে জাগতিক ও মনস্তাত্ত্বিক সঙ্কট, সময়ের পরিবর্তন ও অভিজ্ঞতার ফলে সৃষ্ট মনোজাগতিক সঙ্কট, প্রতারণার শিকার হয়ে নারীর জীবনে নেমে আসা জাগতিক ও মনস্তাত্ত্বিক সঙ্কট প্রভৃতি অনুসন্ধানে সংযুক্ত করা হয়েছে পাঠ নির্ভর আলোচনা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ।

মূলশব্দ: উৎস থেকে নিরন্তর, সঙ্কট, জাগতিক, মনস্তাত্ত্বিক

বাংলাদেশের সাহিত্য অঙ্গনে সেলিনা হোসেন (জন্ম ১৯৪৭) একজন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক। জীবন সচেতন এই শিল্পীর লেখায় যুক্ত হয়েছে দেশ, জাতি ও ঐতিহ্য সচেতনতা। সমাজ ও রাজনীতি সচেতন এই শিল্পী উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে সাফল্যের চূড়ায় আরোহণ করেছেন। খ্যাতিমান এই শিল্পী কেবল উপন্যাসের ক্ষেত্রে নয়, ছোটগল্প রচনায় ও সিদ্ধহস্ত। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'উৎস থেকে নিরন্তর' (১৯৬৯)। এই গ্রন্থে ১৪ টি গল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গল্পগুলোর মাধ্যমে তিনি গ্রামীণ জীবনের পটভূমিতে মানব জীবনের দ্বন্দ্ব, অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম, প্রতিবাদ, পরিণাম তথা জাগতিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিচিত্র সঙ্কটকে রূপায়ণ করেছেন। সমালোচক চঞ্চল কুমার বোসের মতে,

> "ষাটের দশকের শেষ পর্যায়ে প্রকাশিত 'উৎস থেকে নিরন্তর' (১৯৬৯) গ্রন্থে সেলিনা হোসেনের (১৯৪৭) আবেগময় শিল্পদৃষ্টির প্রকাশ ঘটেছে। গ্রামীণ জীবনের পটভূমিকায় দারিদ্র্যজীর্ণ নরনারীর অনিশ্চিত জীবন রূপায়ণের পাশাপাশি নিম্নবিত্ত মানুষের জীবিকার সঙ্কট এবং ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখক গল্প রচনা করেছেন" (বোস, ২০০৯: ১২৬)।

অর্থাৎ সেলিনা হোসেনের 'উৎস থেকে নিরন্তর' গল্পগ্রন্থে গ্রামীন নর-নারীর জীবন ও তাদের সঙ্কটের বিচিত্র দিক সূক্ষ্মতার সাথে শিল্পিত ভাবে উঠে এসেছে। এই সম্পর্কে সমালোচক আজহার ইসলামের মন্তব্যও প্রণিধানযোগ্য,

> "নিয়তির নির্মম ছোবলে বেদনাহত মানুষ যখন নীরবে কাঁদে, তখন তার অকৃত্রিম উপস্থাপনায় শিল্পের যে মাহাত্ম্য ফুটে ওঠে, সেলিনা হোসেনের ছোটগল্পে মানব জীবনের সেই স্পর্শকাতর অনুষঙ্গের চিত্রায়ন আছে। এই দিক দিয়ে সেলিনা নিঃসন্দেহে ট্রাজেডির এক অনবদ্য রূপকার" (ইসলাম, ২০২১: ৪৫০)।

এই গল্পগ্রন্থ নিয়ে গবেষক সিরাজ সালেকিনও গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন,

> "সেলিনা হোসেনের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'উৎস থেকে নিরন্তর' কিছু রোমান্টিক সহজ-সরল কিন্তু সৎ আবেগের বিচ্ছুরণ। জীবনের বৈচিত্র্যময় অন্বেষা, ব্যক্তি ও সমষ্টির অন্তর ও বহিঃসংঘাত, অস্তিত্বের রক্তাক্ত জাগরণ গল্পকারের জীবন আকাঙ্ক্ষার শিল্পিত প্রয়াস" (সৈকত ও পারভীন, ২০১১: ২৩৫) ।

'গৈরিক বাসনা' ছোটগল্পে অঙ্কিত হয়েছে নিম্নবিত্তের জীবনের সঙ্কট। যেখানে দারিদ্র্য ও অভাব অনটনের কারণে ভালোবাসা পূর্ণতা পায়নি, নতুন প্রাণের সঞ্চার কোন আনন্দবার্তা বয়ে আনেনি, সঙ্কট থেকে উত্তরণের চেষ্টায় নেমে এসেছে নতুন সঙ্কট। এই গল্পের প্রধান চরিত্র সাবানি ও গনুভাই। গল্পে চরগাজলা নামে একটি নিচু অঞ্চলের পরিচয় পাওয়া যায়। যেখানে বর্ষা মৌসুমে বেশিরভাগই ডুবে যায়। ফলে সাধারণ মানুষ কাজের অভাবে ভোগান্তিতে পড়ে, খাবারের অভাবে শাপলা, শাকপাতা প্রভৃতি সিদ্ধ খেয়ে কোনরকমে দিনাতিপাত করে। নিম্ন শ্রেণির মানুষের জীবনে দুর্ভোগ নেমে আসলেও সমাজপতি ধনিক শ্রেণির ভান্ডার শূন্য হয় না, বরং এই শূন্যতার মধ্যেও তাদের ভান্ডারের পূর্ণতা রক্ষা করে চলেছে সমাজের এই খেটে খাওয়া নিম্নবিত্ত শ্রেণির দিনমজুরেরা। সমাজে যখন কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ সৃষ্টি হয়

*Corresponding email: tuhin.du.bangla@gmail.com
প্রভাষক (বাংলা), বাংলাদেশ মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি।

উদ্ধৃতি: হাসান, মোঃ তুহিন (২০২৫)। সেলিনা হোসেনের উৎস থেকে নিরন্তর: জীবন সঙ্কটের রূপায়ণ। *জার্ণাল অব ইএলটি এন্ড এডুকেশন, ৮*(২), ৫৭-৬১। https://doi.org/10.5281/zenodo.15400512

Copyright © *JEE, CARD, Hello-Teen, Dhaka, Bangladesh & Author(s)*
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

বা কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টি হয় বা কোন বিপর্যয় ঘটে, তখন সবসময় নিম্ন শ্রেণির মানুষই ভোগান্তির সম্মুখীন হয়। কোন ধরনের বিপর্যয়ই এই উচ্চবিত্ত ধনিক শ্রেণির টিকিটা পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারে না। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোন কারণে খাদ্যের সঙ্কট হলেও তাই তালুকদার আর চৌধুরী বাড়ির সম্পদে কোনদিনই টান পড়ে না। বরং ক্রান্তিকালে খেটে খাওয়া এই দিনমজুর নিম্নবিত্তের পরিশ্রমের উদ্বৃত্ত ফসল গোলা ভর্তি করে এই ধনিক শ্রেণির-

> "চরগাজলা অঞ্চলটা খুব নিচু। বর্ষার পর তিন চার মাস পর্যন্ত অনেক জায়গা পানিতে ডুবে থাকে। পতিত জমি বেশি।তাই ফসল হয় কম। যে কঘর বাসিন্দা আছে তারা সবাই খুব গরীব। দিন আনে দিন খায়। আর এদের পরিশ্রমের উদ্বৃত্তে দিনে দিনে বর্ধিত হচ্ছে তালুকদার আর চৌধুরী বাড়ির সম্পদ" (হোসেন, ২০১৪: ১২) ।

গল্পের মধ্যে সাবানির ভাইয়ের জন্ম হলে তার পরিবার আনন্দিত হতে পারেনি, চিন্তার রেখা সৃষ্টি হয়েছে তার পিতার কপালে, পরিবারের এতগুলো লোকের মুখে কিভাবে আহার তুলে দেবে এ নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছে তার পিতা। জন্ম যেখানে আনন্দের হওয়ার কথা সেখানে নতুন প্রাণের আগমন তাদের জীবনে বিশেষ কোনো আনন্দ এনে দিতে পারেনি। জন্ম যেন এই মানুষদের জন্য বিভীষিকায় রূপান্তরিত হয়েছে। এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখ্য, অসুস্থতা ও জরাজীর্ণতা যেন নিম্ন শ্রেণির মানুষকে বেশি ঘিরে ধরে। এর বহুবিধ কারণ রয়েছে। যেমন: পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, উপযুক্ত বাসস্থানের অভাব, চিকিৎসা সামগ্রির অভাব। এক কথায়, জীবনের প্রয়োজনীয় মৌলিক চাহিদাগুলো থেকে তারা বঞ্চিত। ফলে এখানে দুর্ভোগও বেশি। কলেরার ব্যাপক প্রাদুর্ভাবে সাবানির সদ্যোজাত শিশু ভাইটি পৃথিবীর আলো বাতাসে টিকতে পারেনি, এমনকি তার মায়েরও মৃত্যু ঘটেছে।

গনু ভাই ও সাবানির হৃদয়ে জেগে ওঠা প্রণয় বা ভালোবাসা কোন কিছুই পূর্ণতা পায়নি এই গল্পে। বরং অভাববোধ সাবানিকে গ্রামের চৌধুরী আর তালুকদার বাড়ি থেকে চাল ভিক্ষা করে আনতে বাধ্য করেছে। আর সাহসী ও ব্যতিক্রমী চরিত্র গনুভাই বাধ্য হয়েছে চালচুরির মত কাজ করতে। সে বাঁচতে চেয়েছে, মরতে চাইনি এবং সেই কারণে সে এই পথ বেছে নিয়েছে। কিন্তু এই পথে আসলে বাঁচা যায় না, বরং এই পথ সঙ্কটের মধ্যে নতুন সঙ্কট সৃষ্টি করে-

> "গনু ভাই হতভম্ব। তার নিজের হাতের বোঝাটাও ভয়ানক ভারী মনে হলো। সেও তো চাল নিয়ে এসেছে কিন্তু তালুকদার বাড়ির পাহারাদারদের মাথা ফাটিয়ে। গনুর মনটা শিথিল হয়ে এলো। কোনো উত্তেজনা আর নেই। ও ভাবছে কাল সকালে তালুকদার ওর বাড়ির দরজায় পুলিশ নিয়ে হাজির হবে। হয়তো জেল হবে!"(হোসেন, ২০১৪: ২২)।

খাদ্যের সঙ্কট দূর করতে গিয়ে গনু ভাইয়ের জীবনে নেমে এসেছে নতুন সঙ্কট। এই "কর্মহীনতা এবং জীবিকার সঙ্কট পশ্চাৎপদ গ্রামীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অনিবার্য ফল।...ধারাবাহিক শোষণ ও বৈষম্যের কারণে গ্রামে ব্যাপক সংখ্যক দরিদ্র- বিত্তহীনের বিপরীতে স্ফীত হয়ে ওঠে মুষ্টিমেয় বিত্তবান মানুষ- এই গ্রামীণ বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটেছে গৈরিক বাসনা গল্পে" (বোস, ২০০৯: ১২৭)।

'উৎস থেকে নিরন্তর' এই গল্পগ্রন্থের নামগল্প। এখানে নিম্নবিত্তের সুরত আলী ও তার স্ত্রী ওজুফার জীবনের চরম সঙ্কটকে রূপায়িত করা হয়েছে; যদিও গল্পের সমাপ্তিতে লেখিকা ইতিবাচক বোধের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। সুরত আলী কারখানায় খেটে খাওয়া একজন শ্রমিক, সমাজের প্রান্তিক শ্রেণির প্রতিনিধি। এই সুরত আলীর মধ্য দিয়ে মালিক শ্রেণি তথা শোষক শ্রেণির অন্যায়, নির্যাতন, শোষণ ও জুলুমের বিরূদ্ধে প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়েছে। মালিক শ্রেণি নিম্নবর্গকে শোষণ এবং নিপীড়নের মাধ্যমে নিজেদের পাপের ধনভান্ডারকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলে। যার প্রতিবাদ করলেই এই শ্রমিক শ্রেণির থাকে চাকরি হারানোর ভয়, অনাহারে-দারিদ্র্যে জীবনযাপনের শঙ্কা। এই ভয় ও শঙ্কার বাইরে গিয়ে সুরত আলী তার প্রাপ্যটুকু প্রাপ্তির আশায়, সুস্থ ও সুন্দর জীবনের আকাঙ্ক্ষায় কারখানার শ্রমিকদের নিয়ে বিদ্রোহের আগুন জ্বেলেছে, কারখানার মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে, মালিকদের রাতের ঘুম হারাম করে দিয়েছে। কিন্তু তা সুরত আলীর জীবনে ইতিবাচক কোনো পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয় নি বরং এই প্রতিবাদ তার জীবনে বিভীষিকায় পরিণত হয়েছে -

> "অথচ এমন কি দোষ সুরত আলীদের। কেবল সুস্থ সুন্দর জীবনের প্রত্যাশাই ছিল ওদের। বাঁশের বেড়ার আবু রক্ষা, কলতলার নোংরামির অবসান, ডাল-ভাতের বদলে মাছ-ভাত, কাপড়-চোপড়ের একটু উন্নতি এইতো দাবি! তা ওদের সইল না। সুরত আলীদের সুন্দর ইচ্ছার পুতুলগুলোকে দুমড়ে-মুচড়ে ছুড়ে ফেলে দিল ডাস্টবিনে" (হোসেন, ২০১৪: ১০৭)।

একটু সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় ন্যায্য দাবির পক্ষে দাঁড়ানোই সুরত আলিকে ছয় মাসের জন্য অন্ধকার কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে, বিত্তহীন সুরত আলীর স্ত্রী ওজুফার উপর নেমে এসেছে ভয়ঙ্কর পাশবিকতা। কারাগারের অন্ধকার কুঠুরিতে থাকা অবস্থায় ওজুফাকে নিয়ে যে বীভৎস কল্পনা করেছিল, বাইরে এসে সে দেখতে পেয়েছে তাই সত্যি হয়েছে। মালিকের মদখোর ছেলে তাহের জোরপূর্বক ধর্ষণ করেছে ওজুফাকে এবং ওজুফা পাঁচ মাসের গর্ভবতী। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার আনন্দ মুহূর্তেই বিলীন হয়ে গেছে সুরত আলীর। তবে সে উচ্চবিত্তের এরূপ হীন কর্মের বিরূদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছে তাহেরকে হত্যার মধ্য দিয়ে। সুরত আলীর এই প্রতিবাদের পরিণাম কি হতে পারে তার কোন চিত্র গল্পকার অঙ্কন করেন নি। তবে তাহেরকে হত্যা করার শাস্তি তার জীবনে নতুন কোন ভয়ঙ্কর সঙ্কট সৃষ্টি করবে এটি খুব সহজেই অনুমেয়। গল্পকার নিম্নবিত্তের জীবনের সঙ্কট ও প্রতিবাদের পাশাপাশি গল্পের সমাপ্তিতে এক শুভ মানবিক বোধের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। ওজুফা তাহেরের ঔরসজাত সদ্য জন্ম নেওয়া শিশুকে শুয়োরের বাচ্চা বলে অভিসম্পাত দিলে সুরত আলী তার প্রতিবাদ করেছে-

> "আমি ওকে মানুষ করবো ওজুফা। ও আমার ছেলে। তোর রক্ত আছে ওর গায়ে- ও তোর ছেলে- ও মানুষের ছেলে। আমি আর কোন কিছু জানতে চাই না- ও আমার- আমার- ও আমার" (হোসেন, ২০১৪: ১১১)।

সদ্য ভূমিষ্ঠ হওয়া এই মানব সন্তান নিষ্পাপ। গল্পকার তাকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করার মত উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন সমাজের খেটে খাওয়া অক্ষরজ্ঞানশূন্য তথাকথিত নিচু শ্রেণির সুরত আলীর মধ্য দিয়ে। এমন সাহস ও উদার মানসিকতার সন্ধান আমাদের সমাজে উপরতলার মানুষের মধ্যেও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

'দীপান্বিতা' গল্পের পটভূমি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন। এই গল্পের প্রধান চরিত্র সাদাত আলীর মনোজগতে পেশাদারিত্ব ও হৃদয় অনুভূতির মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে। তিনি পেশায় একজন পুলিশ অফিসার এবং কখনো নিজের দায়িত্বে অবহেলা করেন নি। এই কর্তব্যপরায়ণতার জন্য তিনি তিনবার সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছেন। ছাত্ররা যখন 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চায়' স্লোগান দিয়ে রাস্তায় নেমে মিছিল করেছে তখন তার ডিউটি পড়েছে ঢাকা মেডিকেল কলেজের গেটে। আন্দোলনরত এই শিক্ষার্থীদের মধ্যে রয়েছে তার পুত্র সবিন। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের যৌক্তিকতা সম্পর্কে তিনি অবগত থাকলেও নিজের পেশাদারিত্বের জায়গায় অটল থাকতে চেয়েছেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি পারেননি। মনোজাগতিক সঙ্কট কাটিয়ে তিনি ভাষার পক্ষেই দাঁড়িয়েছেন। আর তাই তার হাতের রাইফেল থেকে গুলি বের হয়নি-

> "রাইফেল তুলে ধরে সাদত আলী। হাতটা কাঁপছে থরথর করে। ছায়াছায়া মুখগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠছে। সারা শরীরে ঘাম ছুটে যায় সাদত আলীর। অথচ কিছুতেই ট্রিগারটা টিপতে পারলো না। রাইফেলটা নামিয়ে ফেলে চিরদিনের কর্তব্যপরায়ণ সাদত আলী আজ প্রাণের তাগিদে হৃদয়ের সহানুভূতিটুকুকে প্রশ্রয় দিয়ে ফেলেছে" (হোসেন, ২০১৪: ৮১)।

অর্থাৎ "একদিকে পুলিশ বিভাগের চাকুরীর দায়িত্বজ্ঞান ও কর্তব্যনিষ্ঠা, অপরদিকে মাতৃভাষার আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী বাঙালি সন্তানদের প্রতি স্নেহ-মমতা এই দুয়ের দ্বন্দ্বে সাদত আলী সাময়িক দ্বিধাগ্রস্ত হলেও তিনি শেষ পর্যন্ত মাতৃভাষার পক্ষেই সরে আসেন" (হোসেন, ১৯৯৭ঃ ১৫০)। এর ফলে ভালো কিছু যে তার সঙ্গে ঘটবে না তা তিনি জানেন। হয়তো কালই অফিসে তার ডাক পড়বে এবং চাকরি থেকে তিনি বরখাস্ত হবেন। এমনকি আরো কঠিন শাস্তিও পেতে পারেন। মাতৃভাষার পক্ষে অবস্থান নেয়ায় তিনি নিশ্চিতভাবে এইসব সংকটের সম্মুখীন হবেন জানার পরও তিনি ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন।

'কাক জ্যোৎস্না' গল্পে এক সঙ্কটাপন্ন পরিবারের চিত্র উপস্থাপন করেছেন সেলিনা হোসেন। যার কেন্দ্রীয় চরিত্র সংগ্রামী, দায়িত্বশীল আটাশ বছর বয়সী এক নারী। এই সময়ে তার নিজের একটি সংসার হওয়ার কথা, জীবনসঙ্গীর সঙ্গে শ্রেষ্ঠ সময় কাটানোর কথা অথচ সেখানে শিক্ষিত এই নারী নিজের কথা চিন্তা না করে পরিবারের অন্যান্য সদস্য বাবা, ভাই, বোনের জীবনের ভার বহন করেছে। এই পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে গিয়ে তার ভেতর-বাহির প্রতিনিয়ত ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। সংসারের প্রতি দায়িত্ব এবং নিজের অপ্রাপ্তিগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব তার জীবনে সঙ্কট সৃষ্টি করেছে। লেখিকা শুকিয়ে মারা যাওয়া একটি গাছের রূপকে বড় আপার জাগতিক ও মনস্তাত্ত্বিক সঙ্কটকে চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন-

> "একটা দোপাটি গাছ শুকিয়ে মরে গেছে তাই কি কান্না? আমি বললাম যে, আরেকটা গাছ লাগিয়ে দেবো তা শুনলই না। এখনো পানি দিচ্ছে গাছটা যদি বেঁচে ওঠে" (হোসেন, ২০১৪: ১০১)।

কেবল এই রূপকের মাধ্যমে নয়, গল্পের শুরুতেই সেলিনা হোসেন বড় আপার দুর্দশাগ্রস্ত জীবনের ইঙ্গিত দিয়েছেন। জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে প্রাপ্তির সংযোগ না ঘটলে মানুষের ভেতরে ভেতরে ক্রমশ যে মৃত্যু ঘটে তার সংবাদ সাধারণত পাওয়া যায় না। তাই শুরুতেই গল্পকার বলেছেন- "মৃত্যু অনেক রকম। তাই সব মৃত্যুতে কাফন হয় না" (হোসেন, ২০১৪: ৯৯)।

বড় আপার ক্লান্তি, দুঃসহ যন্ত্রণা, রংহীন জীবন বাচ্চুকে পীড়িত করেছে। তাই ৭৫ বছর বয়সি পঙ্গু বাবার বেঁচে থাকা, তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বড় আপার পরিশ্রম ও দায়িত্ব পালন তাকে প্রতিনিয়ত যন্ত্রণা দিয়েছে। আর তাই তার মনে হয়েছে এত বছর বয়সেও বাবা কেন বেঁচে আছে, বাবাকে কেন বাঁচতে হবে, বাবা কেন মারা যায় না। জন্মদাতা পিতাকে নিয়ে এমন চিন্তা-ভাবনা কোন সন্তানের সুস্থ মস্তিষ্কের পরিচয় বহন করে না। বেঁচে থাকার লড়াইয়ে পরিবারের সঙ্কট তার মনস্তত্ত্বে প্রভাব ফেলেছে, ফলে জাগতিক ও মনস্তাত্ত্বিক সংকটের সম্মেলনে এক জটিলতা তৈরি হয়েছে এই গল্পে। বাচ্চুর এই চিন্তাধারা কোনোভাবেই কাম্য নয়-

> "বাচ্চুর মনে হয় বুড়ো বয়সে মানুষ কি খুব স্বার্থপর হয়ে যায়? বাবার জীবনের সব আশা-আকাঙ্ক্ষাই তো ফুরিয়ে গেছে তবু বাবা বেঁচে আছেন কিসের জন্য? বাচ্চুর মনে হয় বাবা মরে যাক- তার বদলে বড় আপা বাঁচুক পৃথিবীর সব রসটুকু চুষে নিয়ে, সব রোদ-আলো গায়ে মেখে একটা তাজা জীবনের স্বাদ নিয়ে। কিন্তু হচ্ছে না। বাবা জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে নতুন করে বাঁচতে চাইছেন আর বড় আপা তার আটাশ বছরের যৌবনটাকে নিয়ে একটু একটু করে মৃত্যুর সড়ক ধরে এগিয়ে চলেছেন। নিশ্বাস ফেললো বাচ্চু। এমন ঘটনা ঘটা উচিত ছিল না তবুও ঘটছে" (হোসেন, ২০১৪: ১০০)।

বাচ্চু কেবল এগুলো চিন্তা করেই ক্ষান্ত হয়নি। তার এই বিকৃত চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে বিষ দিয়ে বাবাকে মেরে ফেলার প্রস্তাবের মধ্যে। বড় আপা বাচ্চুর এই প্রস্তাবে আহত হয়েছে। জীবনযুদ্ধ থেকে পালিয়ে না গিয়ে বড় আপা সবার ভার বহন করেছে। ক্লান্ত অথচ সংগ্রামী ও পরিশ্রমী এই নারীর ১৬০ টাকা মাইনের চাকরিটা চলে গেলেও সে শান্ত, আত্মপ্রত্যয়ী এবং আশাবাদী থেকেছে; যদিও সঙ্কট নতুন এক মাত্রা নিয়েছে। এই নারী জানেন নতুন একটি চাকরির ব্যবস্থা করা সহজ হবে না। তারপরও ভেঙে না পড়ে পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখার স্বপ্ন দেখেছে এই নারী। "আর্থিক সংকটে জর্জরিত নাগরিক নিম্নবিত্তের প্রান্তিক পরিস্থিতির রূপায়ণে গল্পকার বাস্তববাদী শিল্পদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন 'কাক জোৎস্না' গল্পে" (বোস, ২০০৯: ১২৭)।

'শেওলা সবুজ রক্ত' গল্পে কেন্দ্রীয় চরিত্র পিতৃপরিচয়হীন কুলসুমের জাগতিক ও মনস্তাত্ত্বিক সংকটের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। এদেশের সামাজিক বাস্তবতায় পিতৃ পরিচয়হীন সন্তানকে যে দুর্ভোগ ও দুর্দশার মধ্য দিয়ে যেতে হয় তারই শিল্পিত রূপ এই ছোটগল্প। এক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় নারীকে বেশি দুর্ভোগের শিকার হতে হয়। গল্পের শুরুতে লেখিকা কুলসুমের স্বপ্ন এবং তা পূরণ না হওয়ার

যন্ত্রণার চিত্র উপস্থাপন করেছেন। প্রকৃতির বর্ণনায় বসন্তের যে আমেজ দেখা যায়, তা কেবল প্রকৃতিতে নয় বরং কুলসুমের শরীর ও মনেও এই বসন্তের আগমন ঘটেছে। কিন্তু সেই বসন্তকে উপভোগ করতে না পারায় তার মধ্যে থাকা চাপা ব্যথার প্রকাশ পেয়েছে বাঁশ বাগানের সজনে তলায়, যেখানে বাতাবি লেবুর গন্ধ বাতাসে ভুরভুর করে সেখানে ফুপিয়ে কান্নার মধ্য দিয়ে। পিতৃপরিচয়হীন ১৯ বছরের সুশ্রী এই যুবতিকে দিয়ে তার মা অদ্ভুত এক ব্যবসায় মেতে উঠেছে। কুলসুম রাজি না হলে তার ভাগ্যে নেমে এসেছে নির্মম প্রহার। গ্রামের কালো আর সমাজের ভাষায় যে সকল মেয়েরা সুশ্রী নয়, তাদের বিয়ের সময় কনে দেখানোর ক্ষেত্রে কুলসুমকে নতুন বস্ত্রে সাজিয়ে দেখানো হয়েছে এবং বিয়ের আসরে পাত্রী বদল করা হয়েছে। এর বিনিময়ে কিছু পয়সা জুটলেও কখনো তা স্পর্শ করে দেখার সুযোগ হয়নি কুলসুমের। তার মন বরাবরই রাজি না হলেও দারিদ্র্যের কারণে মায়ের জুড়াজুড়িতে বাধ্য হয়ে সে এই কাজ করেছে। কিন্তু নাজিম শেখের বিয়ের পাত্রী হিসেবে দেখানোর পর সে আর এই কদর্য কাজকে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেনি। তার বিবেকের কাছে প্রশ্ন জেগেছে রূপ থাকলেই কি এরূপ কদর্য কাজ তাকে করতে হবে? পাত্রীর আসনে বারবার বসার ফলে তার মধ্যে জেগেছে নতুন বউ হওয়ার আশা, জীবনকে উপভোগ করার প্রত্যাশা। আর তাই নাজিমকে সে ভালোবেসে ফেলেছে। বিয়ে বাড়িতে কন্যা বদলের হট্টগোলে বাঁশ বাগানের মধ্যে নাজিম শেখের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হলে নাজিম তাকে বিয়ের কথা বললে সে জানিয়ে দিয়েছে তার চরম দুর্বলতা পিতৃপরিচয়হীনতার কথা। এরপরও নাজিম একবার আগ্রহ প্রকাশ করলে সে তাকে বলেছে তাদের বিয়ে কোনো ভাবেই সম্ভব নয় কারণ পিতার পরিচয় ছাড়া দারিদ্র্যপীড়িত এই কন্যাকে কেউ ঘরের বউ করতে রাজি হবে না। কেউ বিয়ে করলেও বারবার দেখিয়ে দেবে তার অবস্থান এবং পরিণতি শুভ হবে না। এরপর নাজিম আর কোন কথা বলেনি বরং কনের বাবা তার বাবা কলিম শেখকে অনেক টাকা দিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করলে সেই রাতে সে ওই কালো মেয়েকেই বিয়ে করেছে। অন্যদিকে কুলসুমের জীবন অন্ধকারেই রয়ে গেছে। পিতৃপরিচয়হীন এই নারীর জীবনে জাগতিক সঙ্কটের সাথে দেখা দিয়েছে মনস্তাত্ত্বিক সঙ্কট। লেখিকা তার মনোজাগতিক সঙ্কটকে খুবই সূক্ষ্মতার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন-

> "চাপচাপ অন্ধকারের মাঝে এক টুকরো ভাবলেশহীন মাংসের টুকরো হয়ে পড়ে রইল কুলসুম। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বাইরে একটানা ঝিঁঝিঁর ডাক। আর ওর অন্তরে একটা শব্দহীন কান্না। কেউ বুঝতে পারছে না, কেউ জানতে পারছে না কুলসুমের হৃদয়ের কোনো গোপন কোণে রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে। এ রক্তের রং লাল নয়- এ রক্ত সবুজ। এ রক্তের উৎস দেহ নয়- এ রক্তের উৎস মন" (হোসেন, ২০১৪: ৪২)।

দেহ থেকে রক্তক্ষরণ হলে যে যন্ত্রণা হয় তার থেকে কয়েক গুণ বেশি যন্ত্রণা হয় হৃদয় থেকে রক্তক্ষরণ হলে। আর তাই লেখিকা বলেছেন এ রক্তের রং ভিন্ন, সবুজ রং। সমাজে আর আট দশ জন নারী যে স্বাভাবিক জীবন যাপন করে সে সুযোগ হয়তো কুলসুমের জীবনে ঘটবে না। তাকে বয়ে বেড়াতে হবে তীব্র যন্ত্রণা। তাই লেখিকা কুলসুমের হৃদয়ে যে রক্তক্ষরণ হয়েছে সে রক্তকে সবুজ বলে অভিহিত করেছেন। বাবার পরিচয়হীন এই কন্যার মানসিক পীড়া, যন্ত্রণা ও সঙ্কটকে লেখিকা এই ব্যঞ্জনধর্মী বর্ণনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন।

অভিজ্ঞতা, পরিপার্শ্ব ও সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আগ্রহ, পছন্দ, ভালোলাগা, ভালোবাসা, রুচি, চিন্তাভাবনা তথা বোধের যে পরিবর্তন ঘটে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় সেলিনা হোসেনের 'রতিবিলাস' ছোটগল্পে। তবে এটি কেবল পরিবর্তনশীলতা নয়, জীবনের বিশেষ একটি পর্যায়ে গৃহীত কোন সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সোনালি সময় অতিক্রম করার পর মানুষের হৃদয়ে যে সংশয় ও প্রশ্ন জাগে তারও বহিঃপ্রকাশ এই ছোটগল্প। মিসেস খান দেহকে উপেক্ষা করে কেবল হৃদয়ের গুরুত্বকে কেন্দ্র করে ভালবাসার যে নিজস্ব আদর্শ ও শুদ্ধ বলয় গড়ে তুলেছিলেন, তা জীবনের বৃহৎ একটি সময় অতিবাহিত হওয়ার পর বারবার প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে তারই চেতনালোকে। তার জীবনে সৃষ্টি হয়েছে এক জাগতিক ও মনস্তাত্ত্বিক সঙ্কট। জীবনের স্বর্ণালী অধ্যায়ে ২০-২২ বছর বয়সে বিধবা হওয়া এই নারী স্বামীর স্মৃতি রোমন্থন ও একমাত্র কন্যা সন্তানকে আঁকড়ে ধরে জীবনের বৃহৎ অংশটি কাটিয়ে দিতে চেয়েছিলেন । আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বিয়ে করে তাকে নতুনভাবে জীবন আরম্ভ করার কথা বললেও তিনি রাজি হননি। স্বামী হাসিব খানের স্মৃতি নিয়ে তিনি অন্য কোন পুরুষের সাথে সংসার করতে পারবেন না। দেহকে অতিক্রম করে ভালোবাসার স্বর্গীয় যে অবয়ব তিনি নির্মাণ করেছিলেন তা ক্ষত বিক্ষত হয়েছে, প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে বারবার তার পরবর্তী জীবনে; যখন তার কন্যা প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছে এবং তার বিয়ে হয়েছে। বিগত যৌবনের প্রতি আফসোস ও অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটেছে এই নারীর মধ্যে-

> "ভালবাসাকে তিনি তো সবসময়ই দৈহিক স্পর্শের উর্ধ্বে রেখেছেন! তবে কেন আজ এমন করে মনটা বারবার বিদ্রোহ করছে? মিসেস খান চিন্তার সাগরে দিশেহারা হয়ে যান। তবুও যেন জোর করে বলতে চান ভালোবাসি- ভালোবাসি- হাসিব খান কে এখনো ভালোবাসি।...কিন্তু তবুও খটকা থেকে যায়। মনে হয় এভাবে বাঁচা তো বাঁচা নয়" (হোসেন, ২০১৪ঃ ৩৫-৩৬)।

মনকে উপেক্ষা করে কেবল দেহকে কেন্দ্র করে আবার দেহকে উপেক্ষা করে কেবল মনকে ঘিরে যে ভালোবাসার সৃষ্টি হয় তা যেন ভালোবাসার পূর্ণরূপ নয় খন্ডাংশ; যা মানুষের জীবনে জাগতিক ও মনস্তাত্ত্বিক সঙ্কট সৃষ্টি করতে পারে; এমন বার্তাই যেন দিয়ে যায় এই গল্পটি।

'মাস্টার' গল্পে নব বিবাহিত এক নারীর দাম্পত্য জীবনের সঙ্কট প্রকাশিত হয়েছে। মাস্টার হাশেম ভাইয়ের অনর্গল কথা বলার ক্ষমতা ও স্টাইলে মুগ্ধ হয়েছে সুহানী এবং এখান থেকেই হাশেম ভাইয়ের প্রতি তার হৃদয়ে ভালোবাসার সৃষ্টি হয়েছে। হাশেম ভাইকে সে জীবনসঙ্গী হিসেবে পেতে চেয়েছে এবং তাকে জীবনসঙ্গী হিসেবে পেয়েছেও। কিন্তু বিয়ের আগের এবং পরের হাশেম ভাইয়ের মধ্যে সে পার্থক্য খুঁজেছে, কিন্তু কোন পার্থক্য পায়নি। বিয়ের আগে হাশেম ভাইয়ের অনর্গল কথার স্রোতে মুগ্ধ হলেও বাসর রাতে হাশেম ভাইয়ের কথায় সে মুগ্ধ হতে পারেনি। তার মনে হয়েছে হাশেম ভাই এখনো তার সাথে শিক্ষকসুলভ আচরণ করছে। আর তাই সে নিজেকে প্রকাশ

করতে পারছে না। হাশেম ভাই কে তার জীবনসঙ্গী নয় শিক্ষকই মনে হয়েছে। অথচ বিয়ের পর পরিস্থিতি ভিন্নরূপ হওয়া স্বাভাবিক ছিল। শিক্ষক এবং জীবনসঙ্গী এই দুটি বিষয়কে মিলিয়ে ফেলেছে হাশেম ভাই অথচ দুটি এক বিষয় নয়। এই ভারসাম্যহীনতার কারণে তাদের দাম্পত্য জীবনের শুরুতেই সুহানীর মনোজগতে দেখা দিয়েছে একাকিত্ব, সে পতিত হয়েছে এক সঙ্কটের মুখে-

> "বাসর ঘরের সব আলো, রং আর গন্ধটুকু কোথাও খুঁজে পেল না। খাটের উপর ঘুমন্ত মানুষটির মাঝে প্রিয়তমকে আর দেখতে পেল না। মনে হলো বাসর ঘরটি শুধুই পড়ার ঘর- আর হাশেমভাই শুধুই তার মাস্টার। আর কেউ না, আর কেউ না, আর কেউ না" (হোসেন, ২০১৪: ৪৬)।

'ইচ্ছার বাগান কবিতা- আমার ভালোবাসা' গল্পে কবিতা নামের এক সাহসী নারীকে পাওয়া যায়। স্বামীর প্রতারণার শিকার হওয়ায় তার জীবনে যে সংকটের সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে উত্তরণের রাস্তা সে নিজেই তৈরি করেছে। সে শৈশব কৈশোর কাটিয়েছে গ্রামীণ প্রকৃতির সান্নিধ্যে। ঐ বয়সেই পুতুল খেলার সময়ই তার মধ্যে মাতৃস্নেহ জেগে উঠেছে এবং সে স্বপ্ন দেখেছে মা হওয়ার। এক কেরানির সাথে তার বিয়ে হয়েছে। বিবাহিত জীবনের চারটি বছর পার হলেও সে দেখেনি সন্তানের মুখ। ডাক্তারের শরণাগত হলে জানতে পারে তার স্বামীর সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা নেই এবং তার স্বামী আগে থেকেই এই বিষয়ে অবগত। নিজের অক্ষমতার কথা জানার পরও একজন নারীকে না জানিয়ে বিয়ে করা এবং তাকে মাতৃত্বের স্বাদ দিতে না পারাকে কবিতার কাছে প্রতারণা মনে হয়েছে। মানসিকভাবে ভেঙে পড়লেও এক কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে এবং স্বপ্ন পূরণের আশায় স্বামীর বন্ধু তুরীনের সঙ্গে ঘর ছেড়েছে। মা হতে না পারার যন্ত্রণা তার মধ্যে মানসিক সঙ্কট সৃষ্টি করেছিল। আর এই যন্ত্রণা বা সঙ্কট থেকে উত্তরণের জন্য এরূপ কাজ করেছে সে, এই কাজ হয়তো পরবর্তীতে তার জীবনে নতুন সঙ্কটেরও সৃষ্টি করতে পারে। তার এই ঘর ছাড়া কে সমাজ ভালোভাবে নিতে না পারলেও, সে তার স্বপ্ন পূরণের জন্য যে দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে লেখিকা তাকে ইতিবাচকভাবেই উপস্থাপন করেছেন-

> "পথে যখন নেমে এলাম, তখন দেখলাম, কবিতার জন্য কোথাও আমার ক্ষোভ নেই। কবিতার ওপর আমার ঘৃণা নেই। একটা অসম্ভব আত্মতৃপ্তি আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখল। আমার মনে হলো, কবিতা ফুলে ফুলে বিকশিত হয়ে উঠুক- কবিতা শত শত ছেলের মা হোক- কবিতা সার্থক হোক" (হোসেন, ২০১৪: ৫৪-৫৫)।

সেলিনা হোসেন বাংলাদেশের ষাটের দশকে মানুষের টিকে থাকার সংগ্রাম, প্রতিবাদ ও তার পরিণাম অর্থাৎ তাদের জীবনে বিদ্যমান বহুবিধ জাগতিক ও মনস্তাত্ত্বিক সংঙ্কটের রূপায়ণ করেছেন 'উৎস থেকে নিরন্তর' গল্পগ্রন্থে। বর্তমান প্রবন্ধে কেবল 'উৎস থেকে নিরন্তর' গল্পগ্রন্থের কয়েকটি গল্পের মাধ্যমে সমাজের নিম্ন ও নিম্ন মধ্যবিত্তের জীবনের বহুবিধ সঙ্কট নির্দেশ করা হয়েছে। মানবজীবনের এই সকল সঙ্কট সেলিনা হোসেনের অন্যান্য গল্পগ্রন্থেও অনুসন্ধানযোগ্য। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় তাঁর 'খোল করতাল', 'মানুষটি', 'পরজন্ম' প্রভৃতি গল্পগ্রন্থের নাম।

তথ্যসূত্র

হোসেন, সেলিনা। ২০১৪। উৎস থেকে নিরন্তর, দ্বিতীয় সংস্করণ। ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা।
বোস, চঞ্চল কুমার। ২০০৯। বাংলাদেশের ছোটগল্পের শিল্পরূপ, প্রথম প্রকাশ। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
ইসলাম, আজহার। ২০২১। বাংলাদেশের ছোটগল্প বিষয়-ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য। অনন্যা, ঢাকা।
হোসেন, মোহাম্মদ জাহিদ। ১৯৯৭। বাংলাদেশের ছোটগল্পঃ জীবন ও সমাজ, প্রথম প্রকাশ। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
সৈকত ও পারভিন [সম্পা.], ফজলুল হক ও জান্নাতুল। ২০১১। কথা নির্মাতা সেলিনা হোসেন। নবরাগ প্রকাশনী, ঢাকা।

The author declares the originality of the paper.
The journal authority is not accountable for any estimations of the author presented in the article.